স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b
1960-2010
50 YEARS SAVING LIVES
আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

কুষ্ঠরোগ
রোগতত্ত্ব ও চিকিৎসা

সায়রা বানু
আইসিডিডিআর,বি
এসকে আবদুল হাদী
লেপ্রসি কন্ট্রোল ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল

অতি প্রাচীন কাল থেকেই কুষ্ঠরোগ নিয়ে মানুষের মধ্যে নানাপ্রকার ভীতি ও অপসংস্কার প্রচলিত ছিলো। একসময় কুষ্ঠরোগকে বিধাতার অভিশাপ বলে মনে করা হতো। যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৬০০ বছর আগে ভারতে রচিত একটি গ্রন্থে কুষ্ঠরোগের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৭৩ সালে নরওয়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ আরমার হ্যানসেন কুষ্ঠরোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। তখন থেকেই মানুষ কুষ্ঠরোগের কারণ সর্ম্পকে নিশ্চিত হয়। এখন পর্যন্ত কুষ্ঠরোগ বিশ্বব্যাপী একটি অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালে ২,৫৪,৫২৫ জন নতুন রোগী সনাক্ত করা হয়েছে।

কুষ্ঠরোগের প্রকৃতি

কুষ্ঠ একটি দীর্ঘমেয়াদী সংক্রামক রোগ যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি (*Mycobacterium leprae*)-নামক জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। অবশ্য কিছু কিছু আক্রান্ত ব্যক্তি আছে যারা সংক্রমণ ঘটায় না—এ-বিষয়ে পরে বলছি। এ-রোগে মূলত ত্বক এবং প্রান্তিক স্নায়ু (peripheral nerve) আক্রান্ত হয়। কখনো কখনো শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন অস্থি (bone), নাকের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি (mucous membrane), বৃক্ক (kidney) ও পুরুষদের ক্ষেত্রে অণ্ডকোষ (testes) এ-রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক স্নায়ু কর্তৃক সরবরাহকৃত মাংশপেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে।

চিকিৎসা দেওয়া হয় নি সংক্রমণে সক্ষম এমন কুষ্ঠরোগীর হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে এ-রোগের জীবাণু বের হয়ে বাতাসে মিশে নিশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। তবে, শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার কারণে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগেরও বেশি ব্যক্তি এ-রোগে আক্রান্ত হয় না। যেকোনো বয়সের ব্যক্তি এ-রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে, বাংলাদেশে এ-পর্যন্ত ৩ বছর বয়সের নিচে কোনো কুষ্ঠরোগী পাওয়া যায় নি।

কুষ্ঠরোগের জীবাণু শরীরে অনুপ্রবেশের পর রোগের লক্ষণ দেখা দিতে সাধারণত ৩ থেকে ৫ বছর লাগে, যাকে কুষ্ঠরোগের সুপ্তিকাল বলা হয়। কখনো কখনো এই সুপ্তিকাল ২০-৪০ বছর বা তারও বেশি হতে পারে। কুষ্ঠরোগের জীবাণু অত্যন্ত ধীরগতিতে বংশবিস্তার করে বলে এর সুপ্তিকাল এত দীর্ঘ হয়।

অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই কুষ্ঠরোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ত্বকের মাধ্যমে। কারণ এ-রোগের জীবাণু শরীরের ঠাণ্ডা স্থানসমূহ (যেমন প্রান্তিক স্নায়ু ও ত্বক) পছন্দ করে। কোনো লোকের নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশকারী জীবাণু রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে এসব জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় এবং সেখানে বংশবিস্তার ক'রে একসময় ত্বকে বা স্নায়ুতে কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি করে।

কুষ্ঠরোগের লক্ষণ

- চামড়ায় ফ্যাকাসে বা লালচে দাগ দেখা যায়, যাতে কোনো অনুভূতি বা বোধশক্তি থাকে না, চুলকায় না, ঘামে না এবং ঐ স্থানের লোম পড়ে যায়। এর ফলে চামড়া শক্ত ও খসখসে হয়ে যায়
- হাতে বা পায়ে অনুভূতিহীনতা বা ঝিন-ঝিন ভাব অনুভূত হয়
- কান, মুখমণ্ডল ও শরীরের অন্যান্য স্থানে গুটি দেখা যেতে পারে
- কখনো কখনো দাগ বা গুটির পরিবর্তে চামড়া পুরু হয়ে ওঠে
- শরীরের বিভিন্ন প্রান্তিক স্নায়ু মোটা হয়ে যায় এবং তাতে ব্যথা হয়
- কখনো কখনো মাংশপেশীর দুর্বলতা অনুভূত হয় ও মাংশপেশী শুকিয়ে যায়
- হাতে বা পায়ে ব্যথাহীন ঘা বা পুড়ে-যাওয়ার মতো ক্ষত সৃষ্টি হয়

কুষ্ঠরোগের শ্রেণীবিভাগ

কুষ্ঠরোগকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। এ-লেখায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে কুষ্ঠরোগের শ্রেণীবিভাগ আলোচিত হলো।

কুষ্ঠরোগীদের শরীরে মোট দাগের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় চর্মরসে 'এএফবি' বা কুষ্ঠজীবাণুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির

ভেতরের পাতায়

- মায়ের দুধ ও শিশুর বিকাশ
- শিশুদের জন্য পরিপূরক খাবার: আমাদের কতটা সচেতন হওয়া উচিত
- শিশুদের নিউমোনিয়া
- উচ্চ রক্তচাপ এবং সংশ্লিষ্ট জটিলতা প্রতিরোধে করণীয়

বর্ষ ১৯ | সংখ্যা ১
শ্রাবণ ১৪১৭ | আগস্ট ২০১০
ISSN 1021-2078

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক — আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক — প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক — এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক — এম এ রহিম

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

পৃষ্ঠাবিন্যাস — সৈয়দ হাসিবুল হাসান
কম্পোজ — হামিদা আক্তার

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: নিজাম প্রিন্টার্স অ্যান্ড প্যাকেজেস, ঢাকা

ওপর ভিত্তি করে এই রোগকে প্রধানত নিম্নোক্ত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়:

১. পসিব্যাসিলারি (পিবি) কুষ্ঠরোগী

এসব রোগীর শরীরের চামড়ায় দাগের সংখ্যা ১ থেকে ৫ এর মধ্যে সীমিত থাকে। এদের শরীরে খুবই অল্পসংখ্যক জীবাণু থাকে। এর ফলে চর্মরস পরীক্ষায় কোনো কুষ্ঠজীবাণু পাওয়া যায় না। এদেরকে অসংক্রামক কুষ্ঠরোগী বলা হয়, কারণ এরা কুষ্ঠজীবাণু ছড়াতে পারে না। চামড়ায় দাগ ছাড়াও এসব রোগীর একটি প্রান্তিক স্নায়ু মোটা এবং/অথবা ব্যথাযুক্ত হতে পারে। কুষ্ঠরোগীদের শতকরা ৮০-৮৫ জনই এই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত।

২. মাল্টিব্যাসিলারি (এমবি) কুষ্ঠরোগী

এসব রোগীর শরীরের চামড়ায় দাগের সংখ্যা ৬ থেকে শুরু করে অসংখ্য হতে পারে। অনেক সময় চামড়ায় দাগের পরিবর্তে গুটি বা চামড়া মোটা হয়ে যেতে পারে। এদের শরীরে অনেক কুষ্ঠজীবাণু থাকে। এদেরকে সংক্রামক কুষ্ঠরোগী বলা হয়, কারণ চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় এরাই সাধারণত কুষ্ঠজীবাণু ছড়ায়। এসব রোগীর চর্মরস পরীক্ষায় কখনো কখনো কুষ্ঠজীবাণু না-ও পাওয়া যেতে পারে। চামড়ায় দাগ ছাড়াও এসব রোগীর দু'টি বা তারও বেশি প্রান্তিক স্নায়ু মোটা এবং/অথবা ব্যথাযুক্ত হতে পারে। কুষ্ঠরোগীদের শতকরা ১৫-২০ জন এই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত।

রোগ নির্ণয়

কুষ্ঠরোগ নির্ণয় করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো রক্ত পরীক্ষা বা রোগ-নির্ণায়ক পদ্ধতি নেই। কুষ্ঠরোগী সনাক্ত করার জন্য কুষ্ঠরোগের তিনটি প্রধান লক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হয়। লক্ষণ তিনটি হলো:

১. ত্বক/চামড়ায় দাগবিশিষ্ট অনুভূতিহীন গুটি

২. প্রান্তিক স্নায়ু মোটা এবং/অথবা ব্যথাযুক্ত হওয়া

৩. চর্মরস পরীক্ষায় এএফবি (কুষ্ঠজীবাণু) পাওয়া

কোনো ব্যক্তির দেহে প্রধান তিনটি লক্ষণের যেকোনো একটি দেখা গেলে তাকে কুষ্ঠরোগী হিসেবে সনাক্ত করা হয়। এসব লক্ষণের মধ্যে একাধিক লক্ষণ দেখা গেলে রোগ সনাক্তকরণের ভিত্তি আরো দৃঢ় হয়।

কুষ্ঠরোগের জটিলতা

কুষ্ঠরোগের প্রধান জটিলতা দু'টি:

১. কুষ্ঠ রি-অ্যাকশন বা প্রতিক্রিয়া (lepra reaction): কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে পরিলক্ষিত এই প্রতিক্রিয়াসমূহকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

ক. টাইপ ওয়ান রি-অ্যাকশন বা রিভার্স্যাল রি-অ্যাকশন (reversal reaction বা RR)

খ. টাইপ টু রি-অ্যাকশন বা ইরাইথিমা নডোসাম লেপ্রোসাম (erythema nodosum leprosum বা ENL)

২. বিকলাঙ্গতা (deformity)

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা

কুষ্ঠরোগের আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার নাম 'এমডিটি' (MDT) বা 'মাল্টিড্রাগস ট্রিটমেন্ট'। এই ব্যবস্থায় একাধিক অষুধের সমন্বয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে চিকিৎসা গ্রহণ করতে (অষুধ খেতে) হয়।

চিকিৎসার জন্য কুষ্ঠরোগীদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়:

১. পসিব্যাসিলারি লেপ্রসি (PBL)

২. মাল্টিব্যাসিলারি লেপ্রসি (MBL)

পসিব্যাসিলারি কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার মেয়াদ ৬ মাস এবং মাল্টিব্যাসিলারি কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার মেয়াদ ১২ মাস। পসিব্যাসিলারি রোগীদের ২টি ও মাল্টিব্যাসিলারি রোগীদের ৩টি অষুধের সমন্বয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। রিফামপিসিন ও ড্যাপসন-এর সমন্বয়ে প্রদত্ত চিকিৎসাকে বলা হয় এমডিটি পসিব্যাসিলারি রেজিমেন (PBR) এবং রিফামপিসিন, ড্যাপসন ও ক্লোফাজেমিন-এর সমন্বয়ে প্রদত্ত চিকিৎসাকে বলা হয় এমডিটি মাল্টিব্যাসিলারি রেজিমেন (MBR)।

দেরিতে কুষ্ঠরোগ সনাক্ত হলে 'এমডিটি' চিকিৎসার মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ সেরে গেলেও রোগীকে সারা জীবন পঙ্গুত্ব বা অঙ্গ-বিকৃতির বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। সুতরাং চিকিৎসায় অবহেলা করার মানে চিকিৎসাযোগ্য একটি রোগকে লালন করে জীবনকে বিপর্যস্ত করা।

মায়ের দুধ এবং শিশুর বিকাশ

এএসএম আরিফুজ্জামান, আইসিডিডিআর,বি

মায়ের দুধ নবজাতকের জন্য একটি আদর্শ খাবার। শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে-ওঠা, মানসিক বিকাশ ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে জন্মের পর থেকে প্রথম ৬ মাস শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি শিশুর বৃদ্ধি বলতে বুঝায় বয়সের সাথে সাথে তার ওজন, উচ্চতা, মাথার মাপ, ইত্যাদির পরিবর্তন। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থাতেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর বিকাশ হলো একটি শিশুর বয়সের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে তার কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি ও আচরণের পরিবর্তন, যেমন শিশুর ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ বয়স হলে সে মাকে কিংবা অন্য লোককে দেখে হাসে (social smile), ৩ মাস বয়সে তার ঘাড় শক্ত হয়, ইত্যাদি।

শিশুর বিকাশের মূল অংশ হলো মস্তিষ্ক (brain)। মস্তিষ্ক গঠিত হয় অসংখ্য স্নায়ুকোষ (neuron) এবং এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে। একটি স্নায়ুকোষ প্রায় ১৫,০০০ সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এই স্নায়ুকোষগুলো তৈরি হয় গর্ভাবস্থায় এবং বেশিরভাগ (প্রায় ৮৫%) সংযোগ স্থাপিত হয় জন্মের প্রথম তিন বছরের মধ্যে। কাজেই, স্নায়ুকোষের পরিপূর্ণ গঠনের জন্য গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্য, যত্ন, শিশুর সুস্থতা এবং পরিবারে হাসিখুশির পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর প্রতিটি স্নায়ুকোষের ভেতর আন্তঃসংযোগের পরিমাণ বাড়াতে হলে শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি যথাযথভাবে নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি প্রয়োজন পরিপূর্ণ যত্ন। জীবনের শুরুতেই পরিপূর্ণ যত্ন পেলে শিশুর মস্তিষ্কে উদ্দীপনা (stimulation)-এর মাধ্যমে প্রতিটি কোষের সাথে বেশিসংখ্যক সংযোগ স্থাপিত হয়। শিশুর মস্তিষ্কে যতবেশি সংযোগ তৈরি হবে সে ততবেশি মেধাবী এবং সামাজিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। এই সংযোগ বাড়ানোর উৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব (০-৫ বছর)। পরিবারের সবার মধ্যে আনন্দঘন পরিবেশে সযত্নে বেড়ে-ওঠা একটি শিশু ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

বুকের দুধ কিভাবে শিশুর বিকাশে সহায়তা করে

বুকের দুধে এমন বিশেষ কিছু উপাদান রয়েছে যা মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষ এবং এগুলোর মধ্যকার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। Decosahexaenoic acid বুকের দুধে বেশি পরিমাণে থাকে। এটি স্নায়ুকোষের আবরণ তৈরিতে কাজে লাগে, যা

জীবনের প্রথম ৩ মাসে অতি দ্রুত সঞ্চিত হয়। এছাড়া, বুকের দুধের choline, taurine এবং অন্যান্য পেপটাইড এবং oligosaccharide উপাদানও স্নায়ুকোষ গঠনে সহায়তা করে। বুকের দুধের কার্যকর আয়রন (লৌহ) কমবয়সী শিশুর রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করে এবং তা শিশুর বুদ্ধি বিকাশ (cognitive development)-এর সাথে সরাসরি জড়িত। বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের কোলে শিশুর অবস্থান, মায়ের স্পর্শ, মায়ের স্নেহময় দৃষ্টি, মৃদু সুরে গান, ইত্যাদি শিশুর মস্তিষ্কে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, যা সন্তান এবং মায়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে। মায়ের কোলে শিশু নিরাপদ বোধ করে, যা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই নিরাপত্তার মাধ্যমে শিশু শান্ত স্বভাবের হয় ও পরবর্তী কালে তার আত্মবিশ্বাস জন্মে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বুকের দুধ-খাওয়া শিশুদের বুদ্ধিমত্তার মাত্রা প্রক্রিয়াজাত দুধ (formula milk)-খাওয়া শিশুদের তুলনায় ৩.১৬ গুণ বেশি। এসব সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ-করা শিশুদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য আরো বেশি, যার মাত্রা ৫.১৮। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৩ সালে ২২,৩৯৯ জন শিশুর ওপর পরিচালিত একটি জরিপে যারা ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খেয়েছে এবং যারা কখনো বুকের দুধ খায় নি এমনসব শিশুর মধ্যে বিকাশের দিকগুলো তুলনা করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা গেছে, যারা কখনো বুকের দুধ খায় নি তাদের ১৭ শতাংশের কথা বলায় বিলম্ব (expressive language delay), ১০ শতাংশের কথা বুঝতে বিলম্ব (receptive language delay) হচ্ছে এবং ৬ শতাংশ সুক্ষ্ম শারীরিক ক্রিয়া (fine motor skill) এবং ৫ শতাংশের সাধারণ শারীরিক ক্রিয়া (gross motor skill)-সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব শিশু প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খেয়েছে তাদের বিকাশাঙ্ক (development quotient) যারা প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খায় নি তাদের তুলনায় ১.৪ মাত্রা বেশি। আনুপাতিক হারে সামাজিক বিকাশ, সুক্ষ্ম চলনক্ষমতা (fine motor adaptive skill) এবং ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রেও একই রকম ফলাফল লক্ষ করা গেছে। এই সমীক্ষাটি একটি গ্রামে ক্ষুদ্র পরিসরে করা হয়েছে।

অতএব শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য জন্মের পর থেকে প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ এবং ৬ মাস পর থেকে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষ হবে বুদ্ধিদীপ্ত এবং সুনাগরিক।

শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিপূরক খাবার: আমাদের কতটা সচেতন হওয়া উচিত?

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, আইসিডিডিআর,বি

জীবনের প্রথম বছরে শিশুরা দ্রুত বেড়ে ওঠে, তাই এসময়ে শিশুর সঠিক পুষ্টির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, জীবনের প্রথম বছরগুলোতে প্রাপ্ত পুষ্টি শিশুর শৈশবকালীন বিকাশ এবং পরবর্তী কালে পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় সুস্বাস্থ্যের একটি বড় নির্ধারক। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং পুষ্টিবিদগণ জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুর পুষ্টিগত প্রয়োজন অনুযায়ী দিকনির্দেশনা স্থির করেছেন।

জন্মের পর প্রথম ৬ মাস মায়ের দুধ শিশুর জন্য আদর্শ খাবার। বুকের দুধে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যায় না এবং এর সামগ্রিক রাসায়নিক গঠনপ্রকৃতি শিশুদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত গুঁড়ো দুধসহ যেকোনো বিকল্প খাবারের চাইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর। বুকের দুধ গুণগত মানের দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা শিশুর প্রথম ৬ মাস বয়সের পর সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সবধরনের পুষ্টি-উপাদান এবং পর্যাপ্ত ক্যালরি সরবরাহ করে না। সব শিশুকেই জন্মের পর প্রথম বছরে অবশ্যই বুকের দুধ দিতে হবে এবং দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত দেওয়াটা আরো ভালো। তবে, শিশুর বয়স ৬ মাস হলেই তাকে অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার খেতে দিতে হবে।

পরিপূরক খাবার কী?

ছয় মাস থেকে দু'বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা ক্রমশ এককভাবে বুকের দুধ বা কৃত্রিম দুধ খাওয়ার অভ্যাস থেকে সরে আসে বলে শিশুদের ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের (তরল, আংশিক শক্ত, বা শক্ত) পরিপূরক খাবার দিতে হবে। কাজেই, পরিপূরক খাবার হলো এককভাবে বুকের দুধ খাওয়া থেকে সরে এসে ঘরে-তৈরি সব ধরনের খাবার খাওয়ার মধ্যবর্তী পর্যায়ের পরিবর্তনশীল খাবার। এই পরিবর্তনশীল খাদ্যাভ্যাস শিশুকে বড়দের উপযোগী খাবারের সাথে ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে এবং বিভিন্ন ধরনের খাবার ও স্বাদের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করে।

ডায়রিয়া এবং অপুষ্টি

বিশ্বজুড়ে শিশুমৃত্যুর প্রথম কারণ নবজাতকের স্বাস্থ্যগত নানা জটিলতা, যার পরপরই আসে দ্বিতীয় কারণ ডায়রিয়ার কথা। শিশুদের অপর্যাপ্ত শারীরিক বৃদ্ধি এবং অপুষ্টির একটি অন্যতম প্রধান কারণ ডায়রিয়া। প্রতিবছর ৫ বছরের কম বয়সের ১০ কোটি শিশুর মৃত্যু হয়। এর অর্ধেকসংখ্যক মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি এবং ২০ লক্ষ মৃত্যুর কারণ ডায়রিয়া, যা মোট ২৫ কোটি ডায়রিয়ার ঘটনা থেকে ঘটে থাকে। ডায়রিয়ার কারণে বেশিরভাগ মৃত্যু স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ঘটে এবং যেসব শিশু অপুষ্টির শিকার তাদের ডায়রিয়ায় বেশি আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে, ৬ থেকে ১২ মাস বয়সের শিশুরা বেশি ঝুঁকিপ্রবণ কারণ এ-বয়সে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরোপুরি পরিপক্কতা

লাভ করে না, মায়ের দেহ থেকে পাওয়া জীবাণু-প্রতিরোধক উপাদানসমূহ ধীরে ধীরে দুর্বল হয় পড়ে এবং বুকের দুধের পাশাপাশি প্রদত্ত পরিপূরক খাবারের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পরিপূরক খাবার গ্রহণের এই পরিবর্তনশীল সময়টি সীমিত সম্পদশালী দেশগুলোর শিশুদের জন্য বেশ গুরুতর। দৃষ্টান্তনির্ভর তথ্য থেকে দেখা যায়, সীমিত সম্পদশালী দেশগুলোতে শিশুদের পরিপূরক খাবার গ্রহণ অপর্যাপ্ত পুষ্টি এবং অণুজীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অনিরাপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর ফলে বহুবিধ পুষ্টি-উপাদানের ঘাটতি এবং খাদ্যবাহিত জীবাণুর দ্বারা সংক্রমণ ঘটে, যার ফলাফল হিসেবে পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ, বিশেষত ডায়রিয়া, দেখা দিতে পারে।

শিশুদের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার সঞ্চালনে পরিপূরক খাবারের ভূমিকা

রোগজীবাণু বিস্তারে সহায়ক একটি মাধ্যম হলো খাবার। তাই পরিপূরক খাবার শিশুকে পরিপাকতন্ত্রের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর সংস্পর্শে নিয়ে আসতে পারে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে পরিপূরক খাদ্যে এধরনের জীবাণু সনাক্ত করা গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে-জীবাণু লক্ষ করা গেছে, তা হলো *ইশকেরিশিয়া কোলাই*; অন্যগুলো হলো: *শিগেলা*, *ভিব্রিও কলেরি* এবং *সালমোনেলা*। একটি গুরুতর বিষয় হলো, ব্যাকটেরিয়ার কারণে সামান্য সংক্রামিত খাবারের জীবাণুও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে—বিশেষ করে ২০° থেকে ৪০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা খাবারের বেলায় এমন ঘটে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। অণুজীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিপুলসংখ্যক তীব্র ডায়রিয়ার ঘটনা ঘটে সংক্রামিত খাদ্যের মাধ্যমে, যার ফলে অনিরাপদ খাদ্যগ্রহণ রোগীদের পুষ্টিগত অবস্থার অবনতি ঘটায়, যা আগে থেকেই অপুষ্টির শিকার এমন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠে।

খাবার কীভাবে দূষিত হয়

বিভিন্ন উৎস থেকে খাদ্য দূষিত হয়। উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে: 'নাইট সয়েল'—অর্থাৎ মানুষ বা জীবজন্তুর মল, দূষিত পানি, মাছি, গবাদি পশু, অপরিষ্কার বাসন-পেয়ালা এবং ধুলোবালি। কাঁচা খাদ্য প্রায়ই দূষিত দ্রব্যের উৎস হিসেবে কাজ করে, কারণ কিছু খাদ্য অনেক সময় প্রাকৃতিকভাবেই জীবাণু বহন করে অথবা সংক্রামিত জীবজন্তু থেকে আসতে পারে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ব্যক্তি অনেক সময় জীবাণুবাহক হিসেবে বা অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে সংক্রমণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। খাদ্যবাহিত রোগসমূহকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রধানত দু'ধরনের ত্রুটি সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, কারণ এসব প্রক্রিয়া রোগজীবাণুকে বেঁচে থাকতে বা রোগসৃষ্টির উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করে। এই ত্রুটিগুলো হলো: খাবার গ্রহণের অনেক সময় আগে তা প্রস্তুত করা এবং খাবার এমন জায়গায় সংরক্ষণ করা যেখানে তাপমাত্রা জীবাণুযুক্ত ব্যাকটেরিয়া এবং, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, দূষিত উপাদান সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অন্য একটি ত্রুটি হলো: অপর্যাপ্তভাবে রান্না-করা অথবা জীবাণু হ্রাস বা দূর করার জন্য গরম-করা।

শৈশবকালীন ডায়রিয়া কীভাবে কমানো যায়

পরিপূরক খাবার গ্রহণ করার বয়সে খাদ্যবাহিত সংক্রমণের পরিণতি শিশুদের জন্য ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। তবে, কয়েকটি সাধারণ উপায়ে, বিশেষ করে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনের মাধ্যমে, তা প্রতিরোধ করা যায়। উপায়গুলো নিচে বর্ণিত হলো:

খাদ্যসংশ্লিষ্ট পরিচ্ছন্নতা—বোতলে দুধ খাওয়ানো এবং পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর সময় রোগজীবাণুর সঞ্চালন হ্রাস করা

- সম্ভব হলে দুধের বোতল ব্যবহার করবেন না
- দুধের বোতল ব্যবহার করলে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিবেন এবং শিশুকে দুধ খাওয়ানোর আগে বোতলের নিপল গরম পানিতে ফুটিয়ে নিবেন
- শিশু একবারে যতটুকু খেতে পারে ঠিক ততটুকু দুধ বা খাবার প্রস্তুত করুন
- সবার জন্য সাধারণ খাবার তৈরির সময় শিশুর জন্য কিছু অংশ আলাদা একটি পাত্রে সরিয়ে রাখুন যেন তা অন্য কারোর দ্বারা সংক্রামিত না-হয়
- পান করার জন্য অথবা শিশুর জন্য খাবার তৈরি করতে শুধুমাত্র ফুটানো বা অন্য উপায়ে বিশোধিত পানি ব্যবহার করুন
- খাবার তৈরির আগে দুই হাত ও থালা-বাসন ভালোমত ধুয়ে নিন; খাবার খাওয়ানোর আগে নিজের দু'হাত এবং বাসন-পেয়ালা ফুটানো বা অন্য উপায়ে বিশোধিত পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। শিশু যদি নিজ হাতে খেতে চায় তবে তাকে এ-বিষয়ে উৎসাহিত করুন এবং এক্ষেত্রে তার দু'হাতও ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিন
- শিশুকে উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়াবেন না
- মাছি, ধুলোবালি, মোরগ-মুরগি, তেলাপোকা ও কুকুর-বিড়ালের কাছ থেকে রক্ষা করতে সব ধরনের খাবার সবসময় ঢেকে রাখুন
- পরিষ্কার-করা বাসন-পেয়ালা ও হাঁড়ি-পাতিল উপুড় করে রাখুন বা জীবজন্তু থেকে নিরাপদে রাখতে ঢেকে রাখুন
- পানির কলসী সবসময় ঢেকে রাখুন যেন মাছি বা পশুপাখি খাওয়ার পানিকে সংক্রামিত করতে না-পারে

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা—মলত্যাগ ও আনুষঙ্গিক কাজ করার সময় জীবাণুর বিস্তার রোধ করা

- মলত্যাগ করার পর এবং শিশুকে খাওয়ানো বা নিজে খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে দু'হাত ভালোমত ধুয়ে নিন
- শুধুমাত্র ডান হাত দিয়ে বদনা ধরুন যেন বাম হাতের জীবাণু বদনাকে দূষিত করতে না-পারে এবং এর দ্বারা পরবর্তী ব্যবহারকারী সংক্রামিত না-হন
- শিশু মলত্যাগ করার পর মল দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে তাকে অবিলম্বে ধুয়ে পরিষ্কার করুন
- প্রতিসপ্তাহে অন্তত একবার শিশুসহ পরিবারের সকলের নখ কাটুন (বাংলাদেশে মানুষের হাত দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস, কাজেই লম্বা নখ যেকোনো সময় মুখে এবং পরিণামে শরীরে জীবাণুর বিস্তার ঘটাতে পারে)
- মায়েদের উচিত মলত্যাগ করার পর ধোয়া হাত শাড়িতে না-মুছে একটি পরিষ্কার কাপড়ে মুছে ফেলা
- শিশুর মাদুর বা গদি নোংরা হয়ে গেলে তা অবিলম্বে ধুয়ে ফেলুন, যাতে শিশু ময়লা জিনিসের সংস্পর্শে না-যায়

মেঝের পরিচ্ছন্নতা—উঠানের ধুলা-ময়লায় রোগ সৃষ্টিকারী বস্তু স্পর্শ করা কিংবা খাওয়া থেকে শিশুকে বিরত রাখা

- শিশুর খেলার জায়গা দিনে চারবার ঝাড়ু দিন
- ময়লা ফেলার বেলচা দিয়ে উঠান থেকে শিশুর বা অন্যান্য জীবজন্তুর মল অবিলম্বে অপসারণ করুন যেন শিশু সংক্রামিত না-হয়
- একটি গর্তের মধ্যে মল ও উঠানের অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ফেলুন (গর্তটি কমপক্ষে ৩০ সে.মি. গভীর এবং সরু গলাবিশিষ্ট কলসী আকৃতির হতে হবে, যা হাঁড়ির ভাঙা অংশ দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে)
- শিশু মলত্যাগ করার পর একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাকে ধুয়ে পরিষ্কার করুন, যাতে দূষিত পানি চারদিকে ছড়াতে না-পারে
- হামাগুড়ি দেয় এমন শিশুকে ধুলোবালিতে হামাগুড়ি দিতে না-দিয়ে একটি পরিবেষ্টিত স্থানে রাখুন

কোনো শিশুর সুস্থ স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ৬ মাস বয়সের পর থেকে পরিপূরক খাবার তার জন্য যেমন অপরিহার্য, তেমনি এসব খাবারের গুণগত মান রক্ষা করা এবং নানা উপায়ে খাদ্য দূষণের ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ-বিষয়ে শিশুর পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

শিশুদের নিউমোনিয়া

রোগের ইতিবৃত্ত এবং চিকিৎসা

মোহাম্মদ যোবায়ের চিশ্‌তী, আইসিডিডিআর,বি

প্রাচীন কালের চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটস্-এর সময় থেকে নিউমোনিয়ার প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেলেও ১৮৫০ সালে বার্থেজ ও রিলিয়েট নামে দু'জন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম শিশুদের নিউমোনিয়ার বর্ণনা দেন। নিউমোনিয়া খুবই বিপদজনক একটি রোগ। প্রতিবছর সারা বিশ্বে ৫ বছরের কমবয়সী প্রায় ৯ মিলিয়ন শিশুর মৃত্যু ঘটে। এর মধ্যে ১৯ শতাংশ শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি শিশু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহে মারা যায়। এ-বিষয়টি অতি বেদনাদায়ক যে, বিশ্বে প্রতি ৭ সেকেন্ডে একজন শিশু নিউমোনিয়ায় মারা যাচ্ছে। আফ্রিকায় এই মৃত্যুর ৪৬ শতাংশই ঘটে পুষ্টিহীনতা থেকে। অতিসম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, যেসব নিউমোনিয়া রোগীর তীব্র (severe) পুষ্টিহীনতা থাকে তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় তিনগুণ থেকে ১২১ গুণ বেড়ে যায়। অধিকন্তু, পুষ্টিহীন অবস্থায় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। আরো কিছু কারণ নিউমোনিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তার মধ্যে শিশুর কম বয়স, কম জন্ম-ওজন (low birthweight), মায়ের কম বয়স, বাবা-মার নিউমোনিয়া সম্পর্কে কম জ্ঞান, সিগারেটের ধোঁয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষিত ধোঁয়াপূর্ণ এলাকা, দীর্ঘমেয়াদী হৃদরোগ বা দীর্ঘমেয়াদী ফুসফুসের রোগ ও হাঁপানি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, ছেলে-শিশুরা মেয়ে-শিশুদের তুলনায় নিউমোনিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়।

রোগের কারণ

শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ার কারণ একাধিক। নিজ বাড়ি বা বাড়ির আশপাশের পরিবেশ কিংবা হাসপাতাল থেকে শিশু নিউমোনিয়ার জীবাণুতে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, নিউমোনিয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কোনো এলাকায় মহামারীর ফলে নিউমোনিয়া সৃষ্টিকারী জীবাণুর সক্রিয় উপস্থিতি, শিশুর টীকা গ্রহণের ইতিহাস, দূষিত পানি বা রোগাক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শ—এসব বিষয়ও বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা নিউমোনিয়ার সঠিক কারণ জানতে পারি না। সঠিক কারণ নির্ণয় খুবই জটিলতাপূর্ণ, যা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে করতে হয়। আমাদের শুধুমাত্র রক্তের কালচারের ওপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু রক্তের কালচারের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগেরও বেশি ক্ষেত্রে আমরা কোনো জীবাণু পাই না। ফলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা কখনো সত্যিকারের কারণ জানতে পারি না। সেক্ষেত্রে আমরা উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা দিয়ে থাকি। শিশুরা বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। এক মাসের বেশি বয়সের সব শিশুর নিউমোনিয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো ভাইরাস; দ্বিতীয় কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া। তবে, ব্যাকটেরিয়াজনিত নিউমোনিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার ভাইরাসজনিত নিউমোনিয়ার তুলনায় তিনগুণ বেশি। এদের মধ্যে যেসব শিশুর বয়স এক মাসের কম তাদের নিউমোনিয়া হলে এবং সাথে সাথে চিকিৎসা শুরু করা না-গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনা আরো বেড়ে যায়। এই বয়সে নিউমোনিয়ার অতিসাধারণ জীবাণুগুলো হলো: গ্রুপ-বি বিটা-হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস, *এসকেরিশিয়া কোলাই*, *ক্লেবসিয়েলা নিউমোনি*, *ক্লেমাইডিয়া ট্রেকোমেটিস*, সাইটোমেগালো ভাইরাস। অপেক্ষাকৃত কম ক্ষেত্রে যেসব জীবাণু নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করে সেগুলো হলো: *স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস*, *সিউডোমোনাস এরোজিনোসা*, *লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজেন্স*। এক মাস বয়সের বেশি এবং স্কুলগামী শিশুদের নিউমোনিয়ার অতিসাধারণ ভাইরাসগুলো হলো: রেসপিরেটরি সিনসাইশিয়াল ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, অ্যাডিনোভাইরাস, হিউমেন মেটানিউমোভাইরাস। এর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হলো রেসপিরেটরি সিনসাইশিয়াল ভাইরাস যা নিউমোনিয়া ছাড়াও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্রংকিওলাইটিস (bronchiolitis) ঘটিয়ে থাকে। এই বয়সের শিশুদের ব্যাকটেরিয়াজনিত নিউমোনিয়ার সবচেয়ে সাধারণ জীবাণু হলো *নিউমোকক্কাস*। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা যেকোনো বয়সের মানুষ সবচেয়ে বেশি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। *হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা*-নামক ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা প্রচুর শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশে এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে টীকা নেওয়ার ফলে নিউমোনিয়া সৃষ্টিকারী

এই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। নিউমোকক্কাস-এর বিরুদ্ধে যে-টীকা বর্তমানে দিতে বলা হয় তার নাম 23-valent capsular polysaccharide pneumococcal vaccine, কিন্তু ২ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে তা সীমিত মাত্রায় কাজ করে। ক্লেমাইডিয়া ট্রেকোমেটিস ব্যাকটেরিয়া ৩ থেকে ১৯ সপ্তাহ বয়সের শিশুদের নিউমোনিয়া ঘটায়। তাছাড়া, *মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস* দ্বারাও শিশুদের নিউমোনিয়া হয়। নিউমোনিয়ার গৌণ জীবাণুগুলোর মধ্যে *স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস* এবং *নেসারিয়া মেনিনজাইটিডিস* উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই দু'টির যেকোনো একটি ব্যাকটেরিয়ার কারণে নিউমোনিয়া হলে তা খুব দ্রুত মারাত্মক আকার ধারণ করে।

পুষ্টিহীন শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াজনিত নিউমোনিয়ার কারণ যথাযথ পুষ্টিসম্পন্ন শিশুদের চেয়ে আলাদা। পুষ্টিহীন শিশুদের নিউমোনিয়ার জন্য *ক্লেবসিয়েলা নিউমোনি* এবং *স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস* সবচেয়ে বেশি দায়ী। অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া, যেগুলো নিউমোনিয়া ঘটায়, সেগুলো হলো *নিউমোকক্কাস*, *এসকেরিশিয়া কোলাই*, *হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা*, *সালমোনেলা*, *মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস* এবং *সিউডোমোনাস*। তাই পুষ্টিহীন শিশুদের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক নির্ধারণের বিষয়টি স্বাস্থ্যবান শিশুদের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম।

যে-প্রক্রিয়ায় সংক্রমণ ঘটে

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার জীবাণু দূষিত বাতাস বা লালার মাধ্যমে ছড়ায়। যেসব জীবাণু আকারে বড় সেগুলো অবশ্য শ্বাসনালীর মাধ্যমে ফুসফুসের গভীরে যেখানে নিউমোনিয়া হয় সেই এলভিওলাস এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। অবশ্য কিছু কিছু বিশেষ অবস্থায় এবং দুর্বল শ্বাসনালীর ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। এলভিওলাস এলাকায় জীবাণু ঢুকতে পারলেও সেখানে মাইক্রোফাজ-নামক একধরনের জীবাণু-ধ্বংসকারী শ্বেত কণিকার সঙ্গে তাদের আধা-ঘণ্টার মতো যুদ্ধ হয়। এ-সময়ের মধ্যে যদি জীবাণু মাইক্রোফাজের আক্রমণ প্রতিহত করে বেঁচে যায় তবে নিউমোনিয়া ঘটাতে সক্ষম হয়।

উপসর্গ

শিশুদের নিউমোনিয়াতে সাধারণত কাশি ও জ্বরের সাথে শ্বাসকষ্ট থাকে। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস থাকতে পারে অথবা বুকের নিম্নভাগ দেবে যেতে পারে (lower chest-wall indrawing)। যদি কোনো শিশুর হাত, পা, ঠোঁট বা জিহ্বার নিচের ভাগ বা কানের লতি নীল হয়ে যায় বা সম্মতিসূচক ভঙ্গির মতো মাথা নাড়ে, বা খেতে না-পারে, তখন শিশুর এই উপসর্গগুলোকে নিউমোনিয়ার বিপদচিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বিপদচিহ্নের যেকোনো একটির সাথে কোনো শিশুর কাশি বা শ্বাসকষ্ট থাকলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) তাকে খুব তীব্র নিউমোনিয়া (very severe pneumonia) গণ্য ক'রে চিকিৎসা করার পরামর্শ দিয়েছে। নিউমোনিয়ার ধরন নির্ধারণের এই পদ্ধতি (assessment) ০-৫ বছর পর্যন্ত প্রযোজ্য।

০-২ মাস বয়সের শিশুদের কাশি বা শ্বাসকষ্টের সাথে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বা বুক দেবে-যাওয়ার উপসর্গ থাকলে তাকে তীব্র নিউমোনিয়া (severe pneumonia) বলে। ২ মাস থেকে ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে কাশি বা শ্বাসকষ্টের সাথে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস থাকলে তাকে হালকা মাত্রার নিউমোনিয়া (non-severe pneumonia) এবং বুক দেবে-যাওয়ার উপসর্গ থাকলে তীব্র নিউমোনিয়া বলা হয়। ২ মাসের কম বয়সের শিশুদের প্রতিমিনিটে শ্বাস-প্রশ্বাস ৬০ বা তার বেশি, ২ মাস থেকে ১১ মাস পর্যন্ত শিশুদের ৫০ বা তার বেশি এবং ১২ মাস থেকে ৫৯ মাস পর্যন্ত শিশুদের ৪০ বা তার বেশি থাকলে তাকে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিউমোনিয়া রোগের ধরন সহজে নির্ণয় করার জন্য এবং দ্রুত চিকিৎসার স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশের জন্য এধরনের কিছু সূচক নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু পুষ্টিহীন শিশুদের নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে এসবের বেশিরভাগ লক্ষণই পরিলক্ষিত হয় না, এমনকি নিউমোনিয়াতে বিশেষ চিহ্ন হিসেবে স্টেথোস্কোপ-এর মাধ্যমে যে বিশেষ ধরনের শব্দ শোনা যায়, পুষ্টিহীন বাচ্চাদের অধিকাংশের মধ্যে তা শোনা যায় না। অথচ এক্স-রে চিত্রে তাদের অনেকেরই নিউমোনিয়া পাওয়া যায়। তাই তীব্র পুষ্টিহীন শিশুদের নিউমোনিয়ার লক্ষণ থাকুক বা না থাকুক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের সবাইকে নিয়মমাফিক অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে।

রোগ নির্ণয়

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করা হয়। তবে নিউমোনিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বুকের এক্স-রে করা হয়ে থাকে। এক্স-রে চিত্রে স্বাভাবিকভাবে ফুসফুসকে কালচে দেখায়। কিন্তু ফুসফুসের যে-অংশে নিউমোনিয়া হয় সে-অংশ সাদাটে দেখায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক্স-রে থেকে কিছু বুঝা না-গেলে কম্পিউটার টমোগ্রাফি স্ক্যান (CT scan) করা হয়ে থাকে। তবে, এই প্রযুক্তি বিশেষ করে উচ্চমানের চিকিৎসা-সুবিধার জন্য সাধারণত এলভিওলার (alveolar) নিউমোনিয়া থেকে ইন্টারস্টিশিয়াল (interstitial) নিউমোনিয়াকে পৃথকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, ফুসফুসে নিউমোনিয়ার সঠিক অবস্থান নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। আলট্রাসনোগ্রাফি ক'রে ফুসফুসের পর্দার অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।

চিকিৎসা

নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। অনেক সময় শিশুর পরিচর্যাকারী কিংবা বাবা-মা শিশুর নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলো ঠিকভাবে বুঝে ওঠার আগেই শিশু বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভাইরাসজনিত এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত নিউমোনিয়ার মধ্যে পৃথকীকরণের কোনো নিশ্চিত লক্ষণ নেই বলে কোনো শিশুর নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়। সাধারণত নিউমোনিয়া তীব্র বা খুব তীব্র না-হলে অ্যামক্সিসিলিন বা কট্রিমক্সাজল দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে। রোগের তীব্রতা থাকলে শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি ক'রে চিকিৎসা দেওয়া উচিত এবং সেক্ষেত্রে শিরায়/মাংসপেশীতে পেনিসিলিন ও জেন্টামাইসিন দেওয়া যেতে পারে অথবা বর্ধিত মাত্রায় কার্যকর গ্রুপের অষুধ ব্যবহার করা উচিত। পুষ্টিহীন শিশুদের নিউমোনিয়া হলে তা খুব তীব্র নিউমোনিয়া হিসেবে চিকিৎসা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তীব্রতাসম্পন্ন নিউমোনিয়ার রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর আগেই প্রথম ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত।

শিশুদের সর্দি-কাশিতে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই। যেহেতু সর্দি-কাশিতে জ্বর বা কাশি থাকে কিন্তু নিউমোনিয়ার কোনো লক্ষণ থাকে না, সেহেতু জ্বরের জন্য শিশুদের শুধু প্যারাসিটামল দেওয়া যেতে পারে বা শিশুর সারা শরীর ভেজা গামছা বা তোয়ালে দিয়ে মুছে জ্বর কমানো যায়। কিন্তু কাশির জন্য শিশুদের আলাদা কোনো অষুধের প্রয়োজন হয় না। সর্দি থাকলে লবণ-পানি বা নরমাল স্যালাইন দিয়ে নাক পরিষ্কার করে দিলে শিশুরা আরাম বোধ করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, নিউমোনিয়ার যেকোনো লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই চিকিৎসক অথবা স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীর শরণাপন্ন হওয়া খুবই জরুরী। এতে করে শিশুর দ্রুত সেরে ওঠার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং শিশুর বড় ধরনের কোনো বিপদ (যেমন মেনিনজাইটিস, এমনকি মৃত্যু) হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কমে যায়। অধিকন্তু, বাংলাদেশ সরকার হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে টীকা গ্রহণের যে সুযোগ করে দিয়েছে তা গ্রহণের মাধ্যমে নিউমোনিয়ার আক্রমণ কমানো যেতে পারে। যেসব কারণ শিশুদের নিউমোনিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত সেসব বিষয়ে শিশুর বাবা-মা কিংবা পরিচর্যাকারীর যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) এবং সংশ্লিষ্ট জটিলতা প্রতিরোধে করণীয়

দেওয়ান এস আলম এবং বদরুল আলম, আইসিডিডিআর,বি

রক্তনালী (ধমনী)-র ওপর শরীরে বহমান রক্ত যে চাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ (ব্লাড প্রেসার) বলা হয়। রক্তচাপ যদি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলা হয়। রক্তচাপ সাধারণত দুই প্রকার: ১. সিস্টোলিক রক্তচাপ (হৃৎপিণ্ড যখন সংকোচিত হয়) এবং ২. ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ (হৃৎপিণ্ড যখন প্রসারিত হয়)। সিস্টোলিক রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে: মাপকযন্ত্রে পারদস্তম্ভের ১০০-১৪০ মিমি উচ্চতা এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে: মাপকযন্ত্রে পারদস্তম্ভের ৬০-৮৯ মিলিমিটার উচ্চতা।

কারোর সিস্টোলিক রক্তচাপ যদি ১৪০ মিলিমিটারের বেশি হয় অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যদি ৯০ মিলিমিটার বা তার বেশি হয়, তাহলে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে বলা যায়। তবে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্থির বা বিশ্রামরত অবস্থায় পরপর তিনবার রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা রক্তচাপ মাপাতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা অতিক্রম না-করলেও সিস্টোলিক রক্তচাপ পারদস্তম্ভের ১২০ মিলিমিটার এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটারের উপরে হলে স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। উপসর্গবিশিষ্ট বা উপসর্গবিহীন হলেও অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ অনেক ধরনের স্বাস্থ্যসমস্যা বা জটিলতার কারণ হতে পারে, এমনকি আকস্মিক মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ সাধারণত উপসর্গহীন অবস্থায় থাকে বলে বেশিরভাগ মানুষ, যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, তাঁদের অবস্থা অজানাই থেকে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো উপসর্গ দেখা না দেয়। আবার সচেতনতার অভাবে অথবা অসুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন না-হওয়ার কারণে (অর্থাৎ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা না-করার কারণে) আমরা অনেকেই আমাদের রক্তচাপের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হই না। অথচ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের খাদ্যাভ্যাস, কায়িক পরিশ্রমে অনিহা এবং পরিবেশগত কারণে দিনের পর দিন উচ্চ রক্তচাপের রোগী বেড়েই চলছে। ২০০০ সালে পৃথিবীতে ৯৭২ মিলিয়ন (শতকরা ২৬ ভাগ) পূর্ণবয়স্ক লোকের উচ্চ রক্তচাপ ছিলো।

যদি একই হারে বাড়তে থাকে তাহলে ২০২৫ সালে পৃথিবীতে উচ্চ রক্তচাপের রোগীর সংখ্যা হবে ১.৫৬ বিলিয়ন (প্রায় দেড়শ' কোটি)। বাংলাদেশে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০ বছর বা তদুর্ধ্ব মানুষের মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ লোকের সিস্টোলিক উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। একই গবেষণায় উল্লেখ আছে যে, শহরের লোকের চেয়ে গ্রামের লোকদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা বেশি। গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত অন্য একটি গবেষণায় পাওয়া গেছে, ঐ জনগোষ্ঠীর শতকরা ১০ ভাগ পুরুষ এবং শতকরা ১৬ ভাগ মহিলার উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। এই উপাত্ত থেকে সারা বাংলাদেশে কত জানা-অজানা উচ্চ রক্তচাপের রোগী রয়েছে তা ধারণা করা যায়।

যেসব কারণ উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদিও উচ্চ রক্তচাপের কারণ সঠিকভাবে জানা যায় না, তবুও নিচে উল্লেখিত কারণে একজন ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে:

- অত্যধিক বা বাড়তি লবণ-খাওয়া
- ধূমপান
- পারিবারিক উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস
- রক্তনালীর রোগ
- কিডনীজনিত রোগ
- দুঃশ্চিন্তা
- ডায়াবেটিস মেলাইটাস
- হরমোনজনিত জটিলতা
- রক্তের কোলেস্টেরল বা চর্বি বেড়ে-যাওয়া

উচ্চ রক্তচাপের কারণে সৃষ্ট জটিলতা

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না-রাখলে যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলো হলো:

- হার্ট অ্যাটাক
- স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ
- পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস
- হার্ট অকার্যকর হয়ে-পড়া
- দীর্ঘমেয়াদী কিডনীর রোগ এবং কিডনী অকার্যকর হওয়া
- রক্তনালীর রোগ
- উচ্চ রক্তচাপজনিত চোখের জটিলতা (হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি)/চোখের নানা সমস্যা/এমনকি অন্ধত্ব

উচ্চ রক্তচাপ এবং সংশ্লিষ্ট জটিলতা প্রতিরোধের উপায়

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করলে উচ্চ রক্তচাপ এবং তার ফলে সৃষ্ট জটিলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব:

- অতিরিক্ত বা বাড়তি লবণ খাওয়া পরিহার করা
- ধূমপান পরিহার করা
- নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বা ব্যায়াম চালিয়ে-যাওয়া, যেমন: সপ্তাহে কমপক্ষে ৩-৪ দিন ৩০ মিনিট ধরে হাঁটা (প্রথম ১০ মিনিট ধীরে ধীরে, পরবর্তী ১০ মিনিট জোরে হাঁটা, যাতে ঘাম হয় এবং শেষ ১০ মিনিট আবার ধীরে ধীরে হাঁটা)
- দুঃশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা
- চর্বিজাতীয় খাবার কম খাওয়া
- উচ্চ রক্তচাপ এবং সংশ্লিষ্ট জটিলতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা (কমপক্ষে প্রতি ৬ মাসে একবার)
- উচ্চ রক্তচাপ সনাক্ত হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে অথবা নিয়মিত অষুধ খেয়ে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা
- মনে রাখতে হবে, একবার উচ্চ রক্তচাপ সনাক্ত হলে তা উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। কোনো কারণে মনে করা যাবে না যে, উচ্চ রক্তচাপ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে

প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে, যাদের বেশিরভাগই তাদের রক্তচাপের অবস্থা সম্পর্কে জানে না। সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা গেছে, ২০০৫ সালে পৃথিবীতে ৩৫ মিলিয়ন লোক অসংক্রামক রোগে মারা গেছে, যা সর্বমোট প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মৃত্যুর শতকরা ৬০ ভাগ। এই অসংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন অন্যতম। সামান্য সচেতনতার মাধ্যমে আমরা উচ্চ রক্তচাপ সনাক্ত ক'রে এবং নিয়ন্ত্রণে রেখে আমাদের মূল্যবান জীবন রক্ষা করতে পারি ও কর্মক্ষম থাকতে পারি।